নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৬ পৃ: ১০৭-১১৬
© ২০১১ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মাহমুদুল সুমন*

'সাম্প্রদায়িকতা' প্রসঙ্গে একটি মনোলোগ[১]

'To change the world, one has to change the ways of making the world, that is the vision of the world and the practical operations by which groups are produced and reproduced'

P. Bourdieu (1990) from 'Social Space and Symbolic Power' in P. Bourdieu, *In Other Words*, p 137.

১

প্রথম আলো পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগের একটি লেখা, 'সম্প্রদায়ের পরিচিতি' ছাপা হয় ১৩ই জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে। চিঠির লেখক এ এম কায়েস চৌধুরী সম্প্রদায়ের পরিচিতি প্রশ্নে কিছু পর্যবেক্ষণ হাজির করেন। লেখকের বক্তব্য:

"বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মালম্বীর লোক বাস করে। মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে অন্য ধর্মের অনুসারীদের *সংখ্যালঘু* বলা হয়। তাদের *পরিচিতি হয়* 'সংখ্যালঘু' হিন্দু সম্প্রদায়, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায় নামে। এভাবে সংখ্যালঘুর পরিচয় দেয়া *হীনমন্যতার* প্রকাশ, যা কিনা *শ্রেণী-বৈষম্য* সৃষ্টি করে। এতে নাগরিক অধিকারও ক্ষুণ্ন হয়।" (বাঁকা হরফ আমার)

খানিকটা বিক্ষিপ্ত মনে হলেও এই লেখাটি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। লেখাটি পড়তে যেয়ে আমার মনে পড়ছিল ২০০৮ এর জাতীয় নির্বাচন চলাকালীন বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া কর্মীদের রিপোর্টিং-এ *সংখ্যালঘু* শব্দটির বারংবার ব্যবহারের কথা। বিভিন্ন এলাকার হিন্দু ভোটারদের খবর দেবার প্রয়োজন থেকে শব্দটার ব্যবহার শুনছিলাম সংবাদকর্মীদের কাজে। আর এদিকে চিঠি লেখকের বক্তব্য, 'এভাবে সংখ্যালঘুর পরিচয় দেয়া হীনমন্যতার প্রকাশ, যা কিনা শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করে'। ভাবছিলাম লেখক এখানে কী বলতে চেয়েছেন।

লেখাটিতে উত্থাপিত পর্যবেক্ষণ কতগুলো বিষয়কে সামনে নিয়ে আসে। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু শব্দগুলো যে নিছক একটি জনমিতিক বিষয় নয় সেটিও স্পষ্ট হয় খানিকটা এই লেখায়। রাষ্ট্রের একজন নাগরিককে 'সংখ্যালঘু' বা 'সংখ্যাগুরু' এই ক্যাটাগরির মধ্য দিয়ে পরিচিত হতে হবে বা পরিচিত করানো হবে—এটা নিশ্চয়ই অবধারিত কোন বাস্তবতাও নয়! বরং উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতি-রাষ্ট্র কীভাবে এই ভাষা বহন করে চলে তা দেখা জরুরি।[২]

---

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ। ই-মেইল: sumonmahmud@hotmail.com

ভাবছিলাম, উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতি-রাষ্ট্রে 'সংখ্যালঘু' বা 'সংখ্যাগুরু' ক্যাটাগরি আমাদের এই অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসনের নানা কৌশলের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এসেছে। তাত্ত্বিক পরিভাষায় এটাকে কলোনিয়াল গভর্নমেন্টালিটি বলছেন কেউ কেউ (দীপেশ চক্রবর্তী ২০০২, ডেভিড স্কট ১৯৯৯)। তাত্ত্বিকদের একদল মনে করেন ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, বিশেষ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে অনেকটাই পাল্টে দিয়েছে। যার ফলে আজকের বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারতে এক সম্প্রদায়ের সাথে আরেক সম্প্রদায়ের সম্পর্কের (প্রক্সিমিটি) জায়গা থেকে পার্থক্যের জায়গাকেই অবধারিতভাবে নির্মাণ করা হয়। এই নির্মাণ সাম্প্রতিক এবং উপনিবেশের পেটেই এর জন্ম।

এ প্রসঙ্গে বি এস কোহনের গবেষণার কথা অনেকেই বলেন। কোহনের (১৯৮৭) বিশ্লেষণ, ঔপনিবেশিক ভারতে কে বা কারা সংখ্যা 'লঘু' এবং কারা সংখ্যা 'গুরু' বা কোন অঞ্চলে কারা সংখ্যায় 'লঘু' এবং কারা সংখ্যায় 'গুরু' তা কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনামলে অনুষ্ঠিত গণশুনানি এবং সংশ্লিষ্ট 'জ্ঞান' উৎপাদনের আগ পর্যন্ত জানা সম্ভব ছিল না। গণশুনানি কার্যক্রম এই জানাটাকে সম্ভব করে তুলল। কোহন তাঁর একাধিক গবেষনায় এই বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়ে এই দাবি করেছেন যে ঔপনিবেশিক ভারতে বর্ণ ভিত্তিক পরিচয় পোক্ত হয়েছে সেনসাস কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে (১৯৮৭. ১৯৯৬। সেনসাস জনগনকে কতগুলো পশ্লের সম্মুখীন করে তোলে এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রথমবারের মত মানুষকে সেই প্রশ্নে সারা দিতে হয়। জনগন কীভাবে সাড়া দেয় সে সম্পর্কে ধারণা পেতে কোহন উল্লেখিত একটি হ্যান্ডবিল বাংলায় তরজমা করে এখানে উল্লেখ করছি (১৯৮৭: ২৫০):

Remember!
ঘোষণা!

Census Operations Have Begun
সেনসাস কার্যক্রম শুরু হয়েছে

Question **প্রশ্ন**	You should answer! **যে উত্তর দিতে হবে**
Religion ধর্ম	Vedi Dharm বেদ
Sect সেক্ট	Arya Samajist আর্য সমাজ
Caste বর্ণ	Nil নাই
Race জাতি	Aryan আর্য
Language ভাষা	Arya Bhasha আর্য ভাষা

এটি লাহোরের 'আর্য সমাজ' নামক একটি সংগঠনের সেনসাস কমিটি কর্তৃক ১৯৩১ সালে প্রচারিত/বিলিকৃত একটি হ্যান্ডবিল। হ্যান্ডবিলটিতে চলমান সরকারী সেনসাস কার্যক্রমে মানুষজনকে কোন প্রশ্নের কী উত্তর দিতে হবে সে সম্পর্কে আগাম ধারণা দেবার চেষ্টা চলছে এবং এক্ষেত্রে 'আর্য সমাজ' নামক একটি সংগঠনকে 'এগিয়ে' আসতে দেখা যাচ্ছে।

কোহন উত্থাপিত নানা প্রসঙ্গে 'বর্ণ' 'ট্রাইব' এমনকি ভারতীয় 'গ্রাম'—এই পদগুলোর নির্দিষ্ট ঔপনিবেশিক যাত্রাপথ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়[৩]। কাছকাছি অঞ্চলের মধ্যে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়াতেও একই ধরনের তাত্ত্বিক ভাবনা দেখা যায়। যেমন: বেনেডিক্ট এন্ডারসন খুব স্পষ্ট করেই বলতে চেয়েছেন যে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় এথনিক রাজনীতি আধুনিক সময়ে প্রোথিত, এবং এক্ষেত্রে কোন আদি-অকৃত্রিম ইতিহাস খুঁজতে যাওয়ার দরকার নেই এবং এই রাজনীতি মূলত নির্ধারিত হয়েছে ঔপনিবেশিক পলিসির মধ্য দিয়ে। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার এথনিক সত্তার নির্মাণ-কল্পনায় ১৯ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি-সমূহের গুরুপূর্ণ অংশগ্রহণ আছে এবং এভাবে ঐ অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শক্তি নিজেরা সংখ্যালঘু শাসক হয়েও স্থানীয় মালয়দের সাথে এক বৃহত্তর ঐক্য গঠন করে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল (এন্ডারসন উদ্ধৃত হয়েছেন কিংসবারী ১৯৯৮: ৪২৭)। বলা বাহুল্য, এন্ডারসন যে সময়টার কথা নির্দেশ করছেন সেটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমক্রেসির সময়, তাই 'সংখ্যাগুরু'র শাসনকে মনে করা হত আদর্শ। এসবই ঔপনিবেশিক শাসন বা শাসনকৌশলের অংশ হিসাবে এই অঞ্চলে প্রযুক্ত হয়েছে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনীতি/লাইফ-পলিটিকস অনুধাবন করতে যেয়ে এই আলোচনাকে আরো সম্প্রসারিত হতে দেখা যায় সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ কালেকটিভ-এর কাজে (পাণ্ডে ১৯৯০, কবিরাজ ১৯৯২, চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৩)। পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৩) বলেছেন, উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মানুষ-জন ঔপনিবেশিক শাসনের নানা কৌশলসমূহের লিগেসি বহন করে চলে, এটাই উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বসবাসের যন্ত্রনা[৪]। আবার একই স্কুলের আরেক লেখক পাণ্ডে দেখাচ্ছেন, কীভাবে ভারত উপমহাদেশে ১৯ শতকের শেষ ও ২০ শতকের শুরুর 'আধুনিক' রাজনীতির বিকাশ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটায় এবং কখনও কখনও নাটকীয়ভাবে তৈরি করে দেয় পার্থক্যের দেয়াল (পাণ্ডে ১৯৯০)[৫]। পাণ্ডে সাম্প্রদায়িকতা (কমিউনালিজম) প্রসঙ্গে বলছেন, এটি ঔপনিবেশিক জ্ঞানের একটি ধরন (১৯৯০: ৬)। সাম্প্রদায়িকতা প্রত্যয়টি, তাঁর মতে, সে সব কিছুকেই নির্দেশ করে, যা উপনিবেশের দিক থেকে অপক্ক ও আদিম, অর্থাৎ ঐসব কিছু যা উপনিবেশ তার নিজ হিসাবে নয়[৬]। এই লেখকদের অধিকাংশের কাছেই জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি পশ্চিমা বৈশিষ্ট যা পূর্বের দেশ সমূহে সহজে পাওয়া যায় না বা সহজে অনুকরণ করা য়ায় না। ১৯ শতকের শেষের দিকেই কেবল একটা দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে এটা দেখা যায় ভারতে। তবে সেটিও পশ্চিমা মডেলের বোকা অনুকরণ নয় (দেখুন: চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৩)।

এধরনের তাত্ত্বিক উপলব্ধি থেকে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটা পুন:বিবেচনার (রিভিশান) কথা বলছেন। তাঁরা দেখাতে চেষ্টা করছেন মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক উপনিবেশ-পূর্ব সময়ে আরো বেশি স্থানিক এবং নানারূপ সম্পন্ন ছিল। আর এ কারণেই একটা টোটালাইজিং ন্যারেটিভের বদলে তাঁরা খুঁজছেন খণ্ডকে। যেমন পাণ্ডে বলছেন:

> যেটাকে একজন ইতিহাসবিদ বলবেন 'খণ্ড'-একজন তাতীর পত্র, কোন এক নামহীন কবির কবিতা...এই সবই রাষ্ট্রের দিক থেকে ইতিহাস নির্মাণকে প্রশ্ন করতে, অন্য ইতিহাস চিন্তায় এবং ঐ প্রশ্নবদ্ধ ক্ষেত্রগুলোকে, (যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ধরনের একতা গঠন করতে চেষ্টা করা হয় এবং অন্যগুলোকে বাদ দেয়া হয়) চিহ্নিত করতে কেন্দ্রীয়ভাবে জরুরি (পাণ্ডে ১৯৯১: ৫৭১)।

২

সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ কালেকটিভের গবেষণা তালিকায় এইরকম আরেক গবেষণা দীপেশ চক্রবর্তীর *হ্যাবিটেশনস অব মডার্নিটি* বইটি (২০০২)। এক প্রবন্ধে সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ও পার্থক্য প্রশ্নে একটা দারুণ বিশ্লেষণ পাই। প্রাসঙ্গিক বিচারে এখানে সেই লেখার খানিকটা উল্লেখ করছি[৭]। দীপেশ চক্রবর্তী গল্পটা নিয়েছেন চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের একটি বই থেকে। ১৯২০-১৯৩০ এর কথা। এই সময়কালে সেন বড় হচ্ছিলেন ফরিদপুরের একটি জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পরিবারে। সে সময় মুসলমানদের সাথে তেমন ওঠা বসা ছিল না পরিবারটির। মৃণাল সেনের লেখা থেকেই জানা যায় যে একবার মৃণালের বড়ভাই স্কুলের এক মুসলমান ছেলের কবিতা বাবাকে দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। বাবা সেই কবিতা দেখে মুগ্ধ হন এবং ছেলেকে বলেন স্কুলের বন্ধুটিকে বাড়িতে ডেকে আনতে। সেই মোতাবেক একদিন ছেলেটি বাড়িতে আসে, এবং এই পরিবারের মানুষগুলোর ভালবাসা পেয়ে মৃণাল সেনের ভাষায় পরিবারের একজন হয়ে যায়। সেই তরুণ কবির ডাক নাম সাধু (কবি জসীমুদ্দিন) এবং মৃণালের স্মৃতিতে সাধু এই পরিবারেরই একজন সদস্য হয়ে যায়। মৃণাল একটু বড় হবার পরেই বুঝতে পারেন যে এই ছেলেটি তাদের ভাই নয়।

দীপেশ চক্রবর্তীর মতে মৃণাল সেনের বর্ণনা (ন্যারেটিভ) আমাদের একটি আপদকালীন সময়ে পকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য দাবি কী করে এই অনুমিত (পিউটেটিভ) জ্ঞাতিসম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে দেয় তা দেখতে সাহায্য করে। জসীমুদ্দিন নিজে সেই সময়ে বিকাশমান বাঙালি মুসলমানের চেতনা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তেমনি প্রভাবিত ছিলেন মৃণাাল সেনের বাবা। রাজনীতির আকাশে একটা ডিসকার্সিভ শিফ্‌ট ঘটছিল। মৃণাল সেন স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে বলেছেন, 'ফরিদপুরে কোন সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা দেখা না গেলেও অনান্য অঞ্চলে এই ধরনের সংঘাতপূর্ণ অবস্থা দেখা দিয়েছিল এবং ফরিদপুরে তার প্রভাব পড়ছিল। এ কারণে বড়দের একটু সাবধানে থাকতে হচ্ছিল'। সেন আরো লক্ষ করতেন যে যখনই কোথাও দাঙ্গার খবর শোনা যেত, বাবার মধ্যে একটা হিন্দু ভাব প্রকাশ পেত। বাড়িতে খুব তর্ক-বিতর্ক চলত এবং জসীমুদ্দিন মুসলমানদের পক্ষ নিত। একদিন জসীমুদ্দিন মৃণালের মাকে জিজ্ঞেস করে, "মা,

আমি যদি তোমার সন্তানদের মতই হই, তবে আমাকে কেন বাইরে বসিয়ে খেতে দাও? কেন তুমি তোমার ছেলেদের সাথে একপাতে খেতে দাও না?"

দীপেশ চক্রবর্তীর মতে এই্ আবেগী মুহূর্তটি আমাদের সামনে সম্পর্ক ও পার্থক্য (লেখকের ভাষায় যথাক্রমে প্রক্সিমিটি ও আইডিন্টি) চর্চার সংঘাতময় পরিস্থিতিকে দেখতে সাহায্য করে। মৃণাল সেনের বর্ণনায়, "মা এই প্রশ্নের জবাব দিতে যেয়ে মুস্কিলে পড়েছিলেন। কেননা জসীম যা বলেছিল সেতো আর মিথ্যা ছিল না। কিন্তু মা আমার ছিল উপায়হীন"। সেদিন মা জসীমকে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এভাবে: তিনি বলেছিলেন জসীমকে একসাথে খেতে দিতে তার কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু এমন করাটা বাড়ির কাজের লোকেরা মানবেনা। চোখে জল মা সেদিন আরো বলেছিলেন, "সাধু, তুই হয়তো জানিসনা, এ বাড়িতে আমিই তোর পরে স্নান করতে যাই"।

এই গল্পটা বাঙালি হিন্দু মায়ের ভালবাসার এক অনবদ্য কাহিনী। দীপেশের মতে, আরো অনেক ক্ষেত্রের মত এখানে মমতাময়ী মা সংস্কার ভাঙতে চান কিন্তু তাতে বাধ সাধে বাড়ির অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু এখানেই থেমে না থেকে মমতাময়ী মা আরো যেন বলছেন তাঁর ত্যাগের কথা, মুসলমান সন্তানের জন্য তাঁর সবকিছুকে ছাপিয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রতিদানে তিনি কী পেলেন? দিপেশ চক্রবর্তীর মতে মায়ের এই ডাক যতই করুণ শোনাক না কেন এই গল্পটা এবং এরকম আরো অনেক হিন্দু বাঙালির গল্প একটা 'অন্য'র ডাক না শুনতে পাওয়ার পরিচয় বহন করে। এই না শুনতে পাওয়াটা সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রদায়ের পার্থক্যকে (এথনিক ডিসটেন্স) যেমন সূচিত করে, তেমনই পয়দা করে সহিংসতা।

দীপেশ চক্রবর্তীর বক্তব্যের মোদ্দা কথা হচ্ছে, বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠিত রাজনৈতিক পরিবর্তন কীভাবে এক সম্প্রদায়ের সাথে আরেক সম্প্রদায়ের মানুষের মেলামেশার ক্ষেত্রটিকে সংকুচিত করে ফেলে এবং কীভাবে মানুষজন এই বদল দ্বারা প্রভাবিত হয় বা এথনিক রাজনীতিতে অংশ নিতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে দেশ ভাগের সাম্প্রতিক ইতিহাস গবেষণার কথা উল্লেখ করেন তিনি। দেশবিভাগের সাম্প্রতিক ইতিহাস গুরুত্ব দিচ্ছে 'দৈনন্দিন'-এর সেই মুহূর্তের উন্মোচনকে যেখানে সম্পর্ক ও পার্থক্য (প্রক্সিমিটি ও আইডিন্টি) দুই-ই দেখা যায় ভিন্নতার রাজনীতিতে[৮]। ইতিহাস ও স্মৃতির অনুসন্ধান দেখায় যে, কেবল একটা মানবিক মূল্যবোধই আমাদের চিন্তায়-বর্ণনায় একটা নৈতিক অবস্থান দেয়, যা হত্যা বা ধ্বংসের বদলে একে প্রতিরোধে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, সাহস যোগায়। ইতিহাসেরও, সাহিত্য ও দর্শনের মত সমালোচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা জরুরি।

৩

নৃবিজ্ঞানসহ সমাজবিজ্ঞানের অপরাপর শাস্ত্রে এথনিক রাজনীতি তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে ১৯৮০-র দশক থেকেই। এই তাত্ত্বিক ঝোঁকটা নানা দিক থেকেই এসেছে এবং আসছে। গত শতকের শেষ দশকে রোয়ান্ডার 'ট্রাইবাল' সংঘাত[৯], পূর্ব ইউরোপের বলকান এলাকায় সহিংস ঘটনা[১০], পশ্চিম ইউরোপের কলোনী পরবর্তী ডায়াসপোরা আইডিন্টিটির প্রশ্ন এবং দক্ষিণ

এশিয়ার 'সাম্প্রদায়িক' রাজনীতি[১১]—এসবই কাজ করছে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত হিসাবে। মোটা দাগে যে বিষয় গুলোর দিকে গবেষকরা নজর দিতে সচেষ্ট হয়েছেন সেগুলো হচ্ছে: কীভাবে খুব অল্প সময়ের পরিসরে এক সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে আরেক সম্প্রদায়ের মানুষের সম্পর্কের বদল ঘটে। এই প্রশ্ন যেমন বলকান এলাকার এক গোষ্ঠীর সাথে আরেক গোষ্ঠীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য একই জাতি-রাষ্ট্রের স্পেসে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মালম্বী জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ক বুঝতেও[১২]। দক্ষিন এশিয়ার প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নটির আরো একটা কাছাকাছি ধরন হয়তো এরকম: কী প্রক্রিয়ায় এক সম্প্রদায়ের সাথে আরেক সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার 'সহিষ্ণুতা' সহিংসতায় রূপ নেয়। নৃবিজ্ঞানের গবেষণা পরিমণ্ডলে এই ধরনের তাত্ত্বিক ঝোঁক দেখা যায়। তার কিছু আলামত দেখতে পাওয়া যায় এথনিসিটি বিষয়ক আলোচনাতেও, বিশেষ করে ইউরোপের প্রেক্ষিতে[১৩]। গবেষকদের এই দলটি ফুকো এবং দেরিদার তাত্ত্বিকতার প্রভাবে এসেনসিয়াল বিরোধী (এন্টি-এসেনসিয়ালিস্ট) হয়ে ওঠেন। গত শতকের মাঝামাঝি সময়ের গুরুত্বপূর্ন দার্শনিকদের চিন্তার ছায়া পাওয়া যায় এই এন্টি-এসেনসিয়ালিস্টদের কাজে[১৪]।

এই আলোচনার শুরুতে উল্লিখিত চিঠিতে ফিরে যাই। লেখক এখানে কীভাবে সম্বোধন (নামকরণ) করা যেতে পারে তার একটা ধারণা দিয়েছেন: সব ধর্মের নাগরিককে বাঙালি মুসলমান, বাঙালি হিন্দু, বাঙালি খ্রিস্টান, বাঙালি বৌদ্ধ অথবা বাংলাদেশের মুসলমান, বাংলাদেশের হিন্দু..ইত্যাদি এভাবে পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে বলে তিনি মত দেন। এই বিতর্ক এখানেই শেষ হবে বা হচ্ছে, তা মনে হয় না। তবে নিশ্চিত করেই বলতে পারি লেখক 'সংখ্যালঘু' বা 'সংখ্যাগুরু' শব্দগুলোর ব্যবহার সমর্থন করেন না। উল্লিখিত চিঠিটির সূত্র ধরে সংক্ষিপ্ত এই লেখায় একটা তাত্ত্বিক অবস্থানকে চিহ্নিত করতে চেয়েছি। এই অবস্থানটি অনড় পার্থক্য বা শ্রেণীকরণ বিরোধী এবং সেই পক্ষেই কিছু যুক্তি হাজির করেছি। মোটের উপর ক্যাটাগরিকরণ যে একটি সমস্যাজনক অনুশীলন এবং এটি যে ('সংখ্যালঘু' বা 'সংখ্যাগুরু') কেবল একটি জনমিতিক সিদ্ধান্ত নয়, এর সাথে শাসন-কৌশলের নানা টেকনলজি যুক্ত (এই ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসন কৌশলকে বোঝানোা হয়েছে), সে দিকে নজর দিতে সচেষ্ট হয়েছি। ক্যাটাগরিকরণ ক্ষমতা সম্পর্কের বিষয়। ক্ষমতা সম্পর্ক উন্মোচন করাটাই এখানে জরুরি তাত্ত্বিক কাজ। এ প্রসঙ্গে হেইডেন ইউরোপের বলকান এলাকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার এথনিক রাজনীতির এক তুলনামূলক পর্যালোচনা শেষে বলেন তাত্ত্বিকের কাজ হচ্ছে:

> "সকল দল ও পরিচয়ের ফ্লুইডিটি ও পরিবর্তনশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এমন একটি উপায় বের করা যার সাহায্যে অতীতের ব্যবহারকে বর্ণবাদী (রেসিস্ট), যৌনবাদী (সেক্সিস্ট) এবং অপরাপর নিপীড়নমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায়' (হেইডেন ২০০২)।

তুলনামূলক বিচারের কথা (তৃতীয় বিশ্বে নৃবিজ্ঞান চর্চার রিসোর্স কনসট্রেইন্টস-এর কথা মাথায় রেখে কথাটা বলছি) বাদ দিলেও, কেবলমাত্র দক্ষিন এশিয়ার প্রেক্ষিতকে সামনে নিয়েও আমরা এই তাত্ত্বিক উপলব্ধিগুলো নিয়ে ভাবতে পারি।

টীকা

১। মনোলোগ শব্দটার একাধিক অর্থ থাকলেও অন্তত দুটি মানে যথাক্রমে একালাপ ও স্বগতোক্তি (বাংলা একাডেমি ইংলিশ বাংলা ডিকশানরি ১৯৯৩ এই লেখাটির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। একাডেমিক প্রবন্ধের প্রচলিত কাঠামোর বাহিরে আলাপ তুলবার রাস্তা হিসাবে এই শব্দটির মানে খুঁজলাম।

২। আমার এই বয়ানে রাষ্ট্রকে একটি কেন্দ্রীয় অনুঘটক হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে গেল। সাম্প্রতিক সময়ে ট্রান্সন্যাশনাল গভর্নমেন্টালিটি পদ দিয়েও শাসন কৌশলকে বুঝতে চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। ফার্গুসন ও গুপ্ত এই বিষয়ে লিখেছেন: "Two images come together in popular and academic discourses on the state: those of *verticality* and *encompassment. Verticality* refers to the central and pervasive idea of the state as an institution somehow "above" civil society, community, and family. Thus, state planning is inherently "top down" and state actions are efforts to manipulate and plan "from above," while "the grassroots" contrasts with the state precisely in that it is "below," closer to the ground, more authentic, and more "rooted." The second image is that of *encompassment:* Here the state (conceptually fused with the nation) is located within an ever widening series of circles that begins with family and local community and ends with the system of nation-states" এই লেখকদের একটি দাবি হচ্ছে increasingly transnational political economy today poses new challenges to familiar forms of state spatialization. দেখুন: ফার্গুসন ও গুপ্ত (২০০২)। এছাড়া আপ্পাদুরাইয়ের লেখায় এরকম একটা ধারণা পাওয়া যায় যে, জাতি রাষ্ট্র অনবরত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে সীমা টেনে দিচ্ছে এবং এটা থেকে মুক্ত হবার একটা রাস্তা গণ-মধ্যস্থতার ভাষা ও চর্চার মাধ্যমে কোন এলাকার (locality) আরো বেশি ট্রান্সন্যাশনালাইজেশান (transnationalization). এই ভাষার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে মানবাধিকার বিষয়ক ডিসকোর্স যা জাতি-রাষ্ট্রকে ডি-স্টাবিলাইজ করে। আপ্পাদুরাইয়ের বরাতে এই মতামত দিয়েছেন ঘোষ (২০০৬)। এই বিষয়ে পূর্নাঙ্গ আলোচনার জন্য দেখুন: আপ্পাদুরাই (১৯৯৬, ২০০৬)।

৩। দেখুন: কোহন (১৯৯৬) এ নিকোলাস বি ডার্কস লিখিত পূর্বকথন।

৪। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৯৩) গ্রন্থে এই ধরনের আক্ষেপ দেখা যায়।

৫। এক্ষেত্রে আর্কাইভ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন, ১৯শতকের গোড়াতে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক কেমন ছিল এবং কীভাবে সে সম্পর্কে লেখা হত এবং পরবর্তী সময়ে এসে 'জাতীয়তাবাদ' ও 'সাম্প্রদায়িকতা'র যুগ কীভাবে বদল সূচিত করেছে (১৯৯০: iix-ixx)। আর এই বদল উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনীতিতে এখনও যে খুব প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে সেকথা বলেছেন এই সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ কালেকটিভ এর অনেকেই।

৬। পাণ্ডে দেখিয়েছেন যে, এই সময়ের আগে 'রেস' জাতি/জাতীয়তা এমনকি শ্রেণীর মত শব্দগুলো ঔপনিবেশিক লেখক ও প্রশাসকরা নানা অর্থে ব্যবহার করতো। কখনও রাজপুত, শিখ, মুসলমান এবং ভিল-এরকম বিবিধ গোষ্ঠীকে বোঝাতে ব্যবহৃত হত শব্দগুলো। এমনকি ১৮৯০ সালের আর্কাইভেও দেখা যায় আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের ভোজপুরী, ছোট নাগপুরী, বাঙালি ইত্যাদি জাতি হিসাবে অবিহিত করা হয়েছে। একটা ঢালাও পদ হিসাবে 'সম্প্রদায়' শব্দটার ব্যবহার আরো পরে এসেছে বলেই পাণ্ডের মত। অবশ্য তা রেস, ট্রাইব এবং জাতির মত শব্দগুলোকে একেবারে বাতিল করেনি।

৭। আলোচনার এই অংশটি দীপেশ চক্রবর্তীর ২০০২ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে আলোকে করা হয়েছে।

৮। সংঘাত-ময় পরিস্থিতির বদলে 'দৈনন্দিনকে' তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে হেনরী লেফেবর ও ওয়াল্টার বেনজামিন এর পাঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন দীপেশ চক্রবর্তী।

৯। লিসা এইচ মালকি এই বিষয়ে বিস্তারিত কাজ করেছেন। দেখুন: লিসা এইচ মালকি (১৯৯৫)।

১০। গত শতকের শেষ দশকে বলকান অঞ্চলে যে জাতিতাত্ত্বিক নিধন সংগঠিত হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে ইউরোপের একদল তাত্ত্বিক সকল প্রকার জাতিতাত্ত্বিক পিওরিটি বা এসেন্স এর ধারণাকে বর্জন করতে আগ্রহী। চিন্তার এই ধারাটি ইউরোপীয় পরিমণ্ডলে এখনও শক্তিশালী নয় বলেই আমার মনে হয়। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে: বেন্থাল ও নাইট।

১১। সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে লিখতে যেয়ে পাণ্ডে একটি সাফাই দিয়েছেন: "যোগাযোগের সুবিধা, এবং একটি সুবিধাজনক সংক্ষিপ্ত রূপ এই পদ ব্যবহার করতে বাধ্য করে। শব্দটি ভারতের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক শব্দমালায় ঢুকে গেছে: এবং যদিও এই পদটির ব্যহারকে আমাদের প্রশ্ন করতে পারা দরকার, এবং আমার মতে উচিত, তথাপি অন্য কোন উপায়ে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটি দিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও ধারণাকে বর্ণনা করতে চেষ্টা করা হয় তা নিয়ে কথা বলা সহজ নয়" (পাণ্ডে ১৯৯০)।

১২। যেমন ইসরাইলের সাথে প্যালেস্টাইনের অসলো পরবর্তী চুক্তি এবং পরবর্তী পিএনএ (প্যালেস্টিনিয়ান ন্যাশনাল অথরিটি) শাসন কীভাবে পশ্চিম তীরের একটি ফিলিস্তিনি শহরের মুসলমান ও খৃস্টান জনগোষ্ঠীর মাঝে দূরত্ব রচনা করে। এই একই গোষ্ঠী প্রথম ইন্তেফাদার সময় একটা জাতীয়তাবাদী সংহতি অর্জন করতে পেরেছিল। এই রচনা যে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে খোলাসা করে: শত্রুভাবাপন্ন সহিংসতার (এন্টাগনিস্টিক ভায়োলেন্স) একটি সাধারণ ধারণাই যৌথ পরিচয় গঠন প্রক্রিয়াসমূহের কেন্দ্রে থাকে এবং ডিসকোর্সের বদল, কোন কোন প্রেক্ষিতে নতুন নতুন পরিচয়কে সামনে নিয়ে আসে যা আগে রচিত সম্পর্কের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন: বওম্যান (২০০০)।

১৩। এথনিসিটির আলোচনায় এসেনসিয়ালিস্ট হওয়া না হওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যারা বা যেসব সংগঠন আত্মপরিচয়ের নানা প্রজেক্টকে সমর্থন করেন তাঁরা এথনিসিটির নেমিং

প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে একটি সাধারণ নাম বা ব্যানারে অন্তর্ভুক্ত হতে সচেষ্ট থাকেন। এই দলটি অবশ্যই আজকের বিশ্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই ডিসকোর্স তাই কখনো কখনো সাম্প্রতিক ইতিহাস বা স্থানীয় কন্টিজেন্সিকে চিহ্নিত করতে বা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। দেখুন ঘোষ (২০০৬)।

১৪। এই ধারার গবেষণা কাজে নামকরণ (নেমিং) একটি গুরুত্বহ প্রসঙ্গ। ফুকো যেমন বলেছিলেন পাগল বলে কিছু নাই তেমনি অনেক পরে বাটলার বলেছিলেন জেন্ডার বলে কিছু নাই, যা আছে তা হচ্ছে আলাপ, ভাষা, ডিসকোর্স, নারী ক্যাটগরিটি একটি নির্মাণ। ক্যাটাগরিকরণ ক্ষমতা সম্পর্কের বিষয়। গভর্নমেন্টালিটি বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন: ফুকো (২০০০) ও ইন্ডা (২০০০)।

References

Appadurai, A. 1996. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization.* Minneapolis: University of Minnesota Press.

Appadurai, A. 2006. *Fear of Small Numbers.* Duke University Press: Durham and London.

Bourdieu, P. 1990. Social Space and Symbolic Power. In P. Bourdieu, *In Other Words*, p 137.

Bowman, G. 2000. The two deaths of Basem Rishmawi: Identity Constructions and Reconstrutions in a Muslim-Christian Palestinian Community. *Identities: Global Studies in Culture and Power*, March 2001. VIII: 1, pp. 47-81.

Chakrabarty, D. 2002. *Habitations of Modernity.* Delhi: Permanent Black.

Chatterjee, P. 1993. *The Nation and its Fragments.* Princeton: Princeton University Press.

Cohn, B. S. 1987. *An Anthropologist among the Historians and Other Essays.* Delhi: Oxford University Press.

Ferguson, J. and Gupta, A. 2002. Spatializing States: Toward an Ethnography of Neoliberal Governmentality. *American Ethnologist*, 29(4): 981-1002.

Foucault, M. 2000. Governmentality. In *The Essential Works of Foucault*, 1954-1984, vol. 3: Power. James D. Faubion, ed. pp. 201-222. New York: New Press.

Gosh, K. 2006. Between Global Flows and Local Dams: Indigenousness, Locality, and the Transnational Sphere in Jharkhand, India. *Cultural Anthropology*, Vol. 21, Issue 4, pp. 501–534.

Hayden, Robert M. 2002. Antagonistic Tolerance. Competitive Sharing of Religious Site in South Asia and the Balkans. *Current Anthropology*, Volume 43: 2.

Inda, Jonathan X. 2000. Performativity, Materiality, and the Racist Body. *Latino Studies Journal*, Vol 11 No 3 Fall 2000 74-99.

Kaviraj, S. 1992. The Imaginary Institution of India. In P. Chatterjee and G. Pandey (eds.) *Subaltern studies*, VII, pp. 1-39. Delhi: Oxford University Press.

Malkki, L. 1995. *Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania.* Chicago: University of Chicago Press.

Pandey, G. 1990. *The Construction of Communalism in Colonial North India.* Delhi Oxford University Press.

Pandey, G. 1991. In Defense of the Fragment: Writing about Hindu-Muslim Riots in India Today. *Economic and Political Weekly*, Annual Number. Mar: 559-572.

Scott, D. 1999. *Refashioning Futures.* Princeton: Princeton University Press.